OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 208 - 216
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সামাজিক দৃষ্টিকোণে দলিত সম্প্রদায় : মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প

সন্দীপ ঘোষ
গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email : sandipghosh9851@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Dalits, protest, exploitation, upper caste, lower caste, traitor, sexual abuse, fornication, superstition, remonstrate.

Abstract
The term 'Dalit' refers to an ethnic group that is often characterized as an oppressed, tortured, and backward caste. Generally a disenfranchised backward underdeveloped community in Indian Hindu society is known as Dalit. Upper caste people deprive them of all economic, social, political, religious rights. An Indian Bengali writer and human rights activist Mahasweta Devi took pen for their rights. He traveled to different states and worked for the rights and empowerment of Dalit communities like Lodha, Shabar, Santal, Onrao etc. In his writings, he has repeatedly portrayed the unspeakable oppression of the tribal and untouchable Dalit communities at the hands of powerful landlords, moneylenders and corrupt government officials and the silent and vocal protests of Dalits against it. In her short stories 'Draupadi' and 'Shikar' we see the sexual exploitation of the lower caste by the upper caste and their vocal protest against it. On the other hand, in stories like 'Bayen', 'Rudali', 'Dhauli' we see the social stigma given to Dalits due to superstition and vocal protest against it.

Discussion

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জাতিভেদ প্রথা। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় সমাজ জীবনে দুষ্ট ক্ষতের মত নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। আসলে আর্যরা ভারতে এসে দাস বানিয়েছিল ভারতের কৃষ্ণকায় আদিবাসীদের। পরে এই দাসপ্রথাকে যুক্তিগাহ্য ও ধর্মসিদ্ধ করার জন্য তারা প্রবর্তন করে চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার। ঋকবেদে উল্লেখ আছে, ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়ের, উরু থেকে বৈশ্যের এবং পা থেকে শূদ্রের জন্ম হয়েছে। আর এই চার বর্ণের বাইরে পড়ে থাকলে তদানীন্তন সমাজের অসংখ্য মানুষ, যারা অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হত। সময়ের সারণিতে এই নিম্নজাতির সামাজিক মর্যাদাও এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তারা চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বাইরে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। সবশেষে এই নিম্নজাতিও অস্পৃশ্য জাতি বা দলিত হিসাবে পরিচিত হয়। তারা প্রতিনিয়ত উচ্চ জাতি দ্বারা অত্যাচারিত ও শোষিত হতে থাকে। সমাজ বহির্ভূত এই যে পরিচয় গড়ে উঠেছে তাতে তাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন উচ্চবর্ণের লোকেদের কাছে অপবিত্র বলে গণ্য হয়। উচ্চ হিন্দু জাতবর্ণের লোকেদের কাছে দলিতদের স্পর্শ, ছায়া

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মাড়ানো বা তাদের কণ্ঠস্বর শোনাও অপবিত্র বলে মনে হয়। মূলত বৈদিক সমাজে এই শ্রেণি শাসন ও শ্রেণি শোষণকে অব্যাহত ভাবে চালানোর জন্যই প্রচলন করা হয় চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা বা জাতিভেদ প্রথার।

প্রকৃতপক্ষে এই জাতিভেদ প্রথা শ্রেণিশোষণের ব্যবস্থাকে করেছিল আরও বেশি তীব্র, নিষ্ঠুর ও বর্বরাত্মক। সমাজের একটি বিশাল অংশ হওয়া সত্ত্বেও দলিতরা সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষদের কাছে এতটাই অনাদর, অমানবিক আচরণ পেতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে যে সেই সামাজিক অভ্যাস থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তার ফলস্বরূপ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকেই দলিত সম্প্রদায় তাদের অধিকারের জন্য আন্দোলন শুরু করে। এই দলিত আন্দোলনের মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল অস্পৃশ্যতা। তাদের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষদের অত্যাচার, অস্পৃশ্যতার ভাবনাই দলিতদের মনে এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে আন্দোলনের আকার ধারণ করে। সেই নিয়েই রচিত হয় দলিত সাহিত্য। বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ প্রমুখ লেখক দলিতদের নিয়ে সাহিত্য লিখলেও মহাশ্বেতা দেবীর কলমে তা এক আলাদা মাত্রা পেয়েছে। তাছাড়া সাম্প্রতিককালে অভিজিৎ সেন, স্বর্ণ মিত্র, শৈবাল মিত্র, দেবেশ রায়, অমর মিত্র, ভগীরথ মিশ্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী প্রমুখ লেখক দলিতদের নিয়ে চর্চা করছেন এবং দলিত সাহিত্য রচনা করছেন।

এই দলিতদের অধিকারের জন্যই সাহিত্যে প্রতিবাদী কলম ধরেছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর রচনার প্রায় সমস্ত অংশ জুড়েই রয়েছে পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা। মহাশ্বেতা দেবী (১৪ জানুয়ারী ১৯২৬ – ২৮ জুলাই ২০১৬) ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি লেখিকা এবং একজন মানবাধিকার আন্দোলনকর্মী। তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় বিভিন্ন রাজ্যের অন্ত্যজ বা দলিতদের অধিকার ও ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করেন লোধা, শবর, ওঁরাও ইত্যাদি উপজাতি সম্প্রদায়, মহিলা এবং দলিতদের নিয়ে। তিনি বছরের পর বছর পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ের আদিবাসী গ্রামে বসবাস করেছেন। তাদের সাথে বন্ধুত্ব করেছেন এবং কাছ থেকে লক্ষ করেছেন তাদের সংগ্রামকে। তাই আমরা দেখি তাঁর বিস্তৃত কথাসাহিত্যে তিনি অঙ্কন করেছেন ক্ষমতাশালী জমিদার, মহাজন ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি আধিকারিকদের হাতে উপজাতি ও অস্পৃশ্য দলিত সমাজের অকথ্য নির্যাতনের চিত্র। তাঁর লেখার অনুপ্রেরণা সম্পর্কে তিনি বলেছেন –

> "আমার লেখার কারণ ও অনুপ্রেরণা হল সেই মানুষগুলো যাদের পদদলিত করা হয় ও ব্যবহার করা হয়, অথচ যারা হার মানেনা। আমার কাছে লেখার উপাদানের অফুরন্ত উৎসটি হল এই আশ্চর্য মহৎ ব্যক্তিরা, এই অত্যাচারিত মানুষগুলো। অন্য কথাও আমি কাঁচামালের সন্ধান করতে যাব কেন, যখন আমি তাদের জানতে শুরু করেছি। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার লেখাগুলি আসলেই তাদের হাতে লেখা।"[১]

ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতিতে তার কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তুতে এসেছে বিপুল বৈচিত্র্য। ইতিহাসচেতনা থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত জীবনের অন্বেষণ, আদিবাসী শোষণ ও তাদের নিরুচ্চার ও সোচ্চার প্রতিবাদ। তাঁর ছোটগল্প গুলিতে তিনি রেখে গেছেন অন্ত্যজ, দলিত শ্রেণীর মানুষদের জীবনযন্ত্রনার কথা, যেখানে তারা শোষিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত। তাঁর 'দ্রৌপদী', 'শিকার', 'বাঁয়েন', 'রুদালী', 'ধৌলি', 'বিছন' প্রভৃতি গল্পে দলিত শ্রেণির প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষের অত্যাচার যেমন দেখতে পাই তেমনি পাই সমাজের বিরুদ্ধে নিম্নজাতি বা দলিতদের সরব ও নীরব প্রতিবাদ।

মহাশ্বেতা দেবীর একটি শক্তিশালী গল্প 'দ্রৌপদী'। আদিবাসীদের প্রতি সভ্য সমাজের শোষণ এবং সেই শোষণের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে এই গল্পে। নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত এই গল্পে আদিবাসীদের জীবনের নানা বঞ্চনা, তাদের প্রতি নানান অত্যাচার, এবং তাদের প্রতিবাদকে তুলে ধরেছেন মহাশ্বেতা দেবী। নারীর চিরন্তন দুর্বলতা নগ্নতাকেই শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে সোচ্চার প্রতিবাদ তুলে ধরেছেন লেখিকা তাঁর শাণিত উচ্চারণে। গল্পের মূল কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র দ্রৌপদী। অনার্য সাঁওতাল উপজাতির বিদ্রোহের প্রতিনিধি। অন্যদিকে মহাজন কারবারী ও শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি সূর্য শাহু। বিভিন্ন ভাবে এই অন্ত্যজ সমাজকে শোষণ করে চলেছে দিনের পর দিন। তাই সূর্য শাহু ও তার ছেলেকে খুন করার অপরাধে সমস্ত পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ও বিশেষ করে পুলিশ ক্যাপ্টেন অর্জন সিং এর কাছে দ্রৌপদী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মেঝেন ও তার স্বামী দুলন মোষ্ট ওয়ান্টেড। গল্পে উল্লেখিত 'দুই তকমাধারী' পুলিশ ইয়নিফর্মের সংলাপে দ্রৌপদী সম্পর্কে জানা যায়-

"দ্য মোষ্ট নটোরিয়াস মেয়েছেলে। লং ওয়ান্টেড ইন মেনি...।"[২]

১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন অর্জন সিং এর প্রতিনিধিত্বে যৌথ বাহিনীর বাকুলি অপারেশনে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো দ্রৌপদী ও তার স্বামী দুলন। তাই দ্রৌপদী আর তার স্বামী পুলিশের কাছে কুখ্যাত অপরাধী রূপে গণ্য। পরবর্তীতে স্বজাতি দুখীরাম ঘড়ারীর সাহায্য নিয়ে পুলিশ দুলনকে খুঁজে বের করে এবং গুলি করে হত্যা করে এবং মৃতদেহকে টোপ হিসেবে রাখে তাদের শিকার দ্রৌপদীকে ধরার জন্য। কিন্তু সেই চক্রান্তে তারা ব্যর্থ হয়। বরং স্বামীর মৃত্যু হলেও দ্রৌপদী হাল ছাড়েনি একাই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। স্বজাতির সহকর্মী সোমাই ও বুধনার বিশ্বাসঘাতকতায় দ্রৌপদী বেশি দিন আত্মগোপন করতে পারে না। এক সময় ধরা পরে পুলিশের জালে। এর পরে দ্রৌপদীর উপর শুরু হয় অমানষিক ও অমানবিক যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ। সেনানায়কের কঠোর নির্দেশ –

"ওকে বানিয়ে নিয়ে এসো। ডু দি নীডফুল।"[৩]

দ্রৌপদীকে সাধ্যমত বানিয়ে নিয়ে আসে সেনাগণ -

> "তারপর এক নিযুত চাঁদ কেটে যায়। এক নিযুত চান্দ্র বৎসর লক্ষ আলোকবর্ষ পরে দ্রৌপদী চোখ খুলে, কি বিস্ময়, আকাশ ও চাঁদকেই দেখে। ক্রমে ওর মস্তিষ্ক থেকে রক্তাভ আলপিনের মাথা সরে সরে যায়। নড়তে গিয়ে ও বোঝে এখনো ওর দুহাত দু খুঁটোয় এবং দু পা দু খুঁটোয় বাঁধা। পাছা ও কোমরের নিচে চটচটে কি যেন। ওরই রক্ত। শুধু মুখের ভিতর কাপড় নেই। ভীষণ তেষ্টা।"[৪]

এক ঘন্টা ধরে অমানবিক যৌন নির্যাতন ও ধর্ষিত হবার পরেও বিদ্রোহী চেতনায় ভাস্বর দ্রৌপদীকে কিছুতেই দমিয়ে রাখা যায় না। উলঙ্গ দ্রৌপদী আরও বিভৎস হয়ে উঠে সেনা নায়কের কাছে। দ্রৌপদীর নিরস্ত্র প্রতিবাদের সামনে ভিত হন সেনানায়ক পর্যন্ত -

> "কাপড় কী হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু? ...দ্রোপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।"[৫]

আসলে এই সেনানায়কেরা পারে মেয়েদের উলঙ্গ করতে, তাদের লালসা চরিতার্থ করতে কিন্তু সম্মান দিতে পারে না। সেই সম্মান দ্রোপদী নিজেই আদায় করে নিতে চেয়েছে, সেনানায়ক সেখানে পরাজিত। তাই মহাশ্বেতা দেবী একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন -

> "শুধু একটা মেয়েকে উলঙ্গ করা যায়, লালসা চরিতার্থ করা যায়, কিন্তু সম্মান দেওয়া যায় না। অথচ এই গল্পের শেষে সমাজের মানুষ কিন্তু দ্রৌপদীকেই সম্মান করে। এই সম্মান দ্রৌপদী আদায় করে নিয়েছে। আমি চাই সমাজের দ্রৌপদীরা সবাই এইভাবেই জেগে উঠুক, কেড়ে নিক তাদের প্রাপ্য সম্মান।"[৬]

সামাজিক অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই দলিত সমাজ বিশেষত নারীরা যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, সেই লক্ষ্যেই মহাশ্বেতা দেবী তাঁর কাজ করে গেছেন।

সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই লেখিকা লিখেছেন 'রুদালী' গল্পটি। ব্যাপক বৈপরীত্য সমাজিক অবস্থান ও শ্রেণি বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে 'রুদালী' গল্পের কাহিনিকে লেখিকা বিন্যস্ত করেছেন। যেখানে উচ্চবর্ণের শোষক শ্রেণি প্রতিনিয়ত নিংড়ে নেয় দলিত নিম্নশ্রেণিকে। সমাজ সচেতন লেখিকা সেই অমোঘ সত্যকেই তুলে ধরেছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গল্পটি রাজস্থানের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নারীদের নিয়ে লেখা যারা অর্থের বিনিময়ে মৃতের বাড়িতে গিয়ে কান্নাকাটি করে যারা। এই 'রুদালী' গল্পের নায়িকা শনিচরী। শনিচরী, যে কিনা এই গল্পে অন্ত্যজ দুসাদ জাতির প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেও দুসাদ জাতির পুরুষদের সঙ্গে উচ্চবর্ণ রাজপুত জাতির মহাজনীয়ও শোষণে সমানভাবে বিপর্যস্ত। কয়েক বছরে একের পর এক মারা গেছে তার জা, শাশুড়ি, ভাসুর, স্বামী এবং তারপর মারা যায় একমাত্র ছেলে বুধুয়া। কিন্তু পেটের দায়ে, এত মৃত্যুর পরেও শুধুমাত্র নাতি হারোয়াকে বাঁচাতে ব্যস্ত থাকার কারণে শনিচরীর কাঁদা হয়ে ওঠেনি। একদিন হারোয়া ঠাকুমা শনিচরীকে ছেড়ে ম্যাজিসিয়ানদের দলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। অবশেষে এই নারীকে ভাগ্যের পরিহাসে প্রচুর কাঁদতে হয়। যে কান্না স্বামী, শাশুড়ি, ভাসুর, জা, বুধুয়া এদের মৃত্যুর জন্য নয়, তাকে কাঁদতে হয়েছিল পেট চালানোর দায়ে। সে পরবর্তীকালে হয়ে যায় রোনেবালি পেশাদার রুদালী অর্থাৎ পেশাদার ভাবে কাঁদিয়ে। সমাজে মালিক, মহাজনদের কেউ মারা গেলে কাঁদার লোকের অভাব ঘটত, তখন রুদালীদের দিয়ে কাঁদানো হত কারণ রুদালীরা যত উচ্চস্বরে রোদন করে, ততই রাজপুত ব্যক্তিমানুষের পার্থিব মহিমা কীর্তিত হয়, বর্ধিত হয়। সেই কারণেই রুদালীরা অর্থের বিনিময়ে এই কাজটি করে থাকত। অর্থাৎ তাঁকে অর্থ রোজগারের জন্যে এবাড়ি-সেবাড়িতে গিয়ে মাথা চাপড়ে চাপড়ে কাঁদতে হয়েছে। এই গল্পের সূত্র ধরে বলা যায় যে সমাজের হয়ে সামাজিক সত্যতা রক্ষা করাই ছিল এই সমস্ত রুদালীদের আসল ধর্ম এবং সত্য। বিনিময়ে তাদের স্থান ছিল বরাবরই মহাজন শ্রেণির পদতলে। সেখানে পেটের খিদের কাছে সবকিছু হার মেনে যায়।

মহাশ্বেতা দেবীর আর একটি বিখ্যাত গল্প 'শিকার'। গল্পে আমরা পাই ওঁরাও আদিবাসী উপজাতির মেরী নামক নারী চরিত্রটিকে, যে কিনা সোচ্চার প্রতিবাদের প্রতিভূ। তার জন্ম রহস্যের পিছনে রয়েছে সমাজ বহির্ভূত, অবৈধ এক অস্ট্রেলিয়ানের রক্ত। কাজের সুবাদে মেরীর মা ভিকনির সঙ্গে ডিক্সন সাহেবের ছেলের পরিচয় হয় এবং তার ফলস্বরূপ অবৈধ সন্তান মেরীর জন্ম। পরবর্তীতে ডিক্সন সাহেব ও মেরীর বাবা অস্ট্রেলিয়া চলে গেলে সেই বাংলো কিনে নেন প্রসাদজী। কিন্তু মেরী ও তার মা কে তাড়াবার কথা না ভেবে প্রসাদজী নিজের সুবিধার কথা ভেবে দুজনকেই বাংলোতে রেখে দেয়। বস্তুতপক্ষে, মেরী দুর্দম, দুর্দান্ত, কর্মঠ ও সাহসী। মেরী যেমন দেখতে সুন্দর, তেমন সুন্দর গাঁয়ের রং, তেমনি লম্বা। মেরী প্রথম থেকে তার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন। মেরীর কথাবার্তায় এবং কাজকর্মে ব্যাক্তিত্ব ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকেই মেরীর প্রণয়ী হতে চেয়েছে। কিন্তু মেরী প্রত্যাখ্যান করেছে। মেরী উন্নত সভ্য সমাজে বাস করার স্বপ্ন দেখেছে। সে মনে করে সমাজে থেকে উন্নত জীবন যাপন করতে পারবে না –

> "ঝোপড়িতে থাকব, ঘাটো খাব, মরদ মদ খাবে, তেল-সাবান পাব না, ফর্সা কাপড় পরব না, অমন জীবন আমি চাই না।... প্রণয়ী হতে চেয়েছে বহুবার বহুজন। মেরী দা তুলে দেখিয়েছে। তারা বাইরের মানুষ। ভিকনির মতো, তাকেও পেটে বাচ্চা দিয়ে ওরা পালাবে না, কে কথা দিতে পারে।"[৭]

উপরোক্ত কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মেরী চরিত্রের প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার পরিচয় আমাদের সামনে উঠে আসে। মেরী কারও কাছে করুণার পাত্রী হিসাবে থাকতে পছন্দ করেনা। যেমন করেই হোক সে নিজে পরিশ্রম করে পয়সা উপার্জন করবে। সেই অর্জিত পয়সাতেই সংসার গড়তে চায় মেরী। কিন্তু গল্পে দেখি প্রসাদজীর বাড়িতে যেদিন প্রথম তশীলদারের সঙ্গে মেরীর পরিচয় হয়, সেদিনই তার মধ্যে জেগে ওঠে মেরীর দেহের প্রতি অনুগ্র কামনা। যেকোন মূল্যেই মেরীর দেহসম্ভোগ করতে চায় সে। সেই লক্ষ্যকে পূরণ করার উদ্দেশ্যে প্রথমদিকে মেরীকে বস্তুগত প্রলোভন দেখায়। কিন্তু মেরী শুধু প্রত্যাখ্যানই করে না, তীব্রভাষায় তশীলদারকে ভর্ৎসনা করে, ভবিষ্যতে যেন এইরকম কাজ না করে তাও বলে দেয়। কিন্তু তবুও সে নাছোড়বান্দা, বিভিন্নভাবে মেরীকে বিরক্ত করতে থাকে। তাই বিরক্ত মনে মেরী একদিন রাজী হয়ে যায় তশীলদারের পূর্ব পরিকল্পিত স্থানে অভিসারের জন্য। বহু প্রতিক্ষায় প্রতিক্ষিত তশীলদার দৈহিক মিলনের আস্বাদে যখন টগবগ করে ফুটছে, তখনই তাকে মেরীর দা-এর কোঁপে নিধন হতে হয়েছে। মাংসলোলুপ মানুষবেশধারী পশু তশীলদারের নিধনকে মেরীর মনে হয় 'বড় শিকার'। তাই সে আনন্দিত, পরিতৃপ্ত -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "কয়েক লক্ষ চাঁদ কাটল। মেরী উঠে দাঁড়াল। রক্ত? জামায়? কাপড়ে? নালায় ধুয়ে নেবে... মেরী বেরিয়ে এলো। নালার দিকে চলল। নালায় নেমে নগ্ন হয়ে স্নান করতে করতে ওর মুখ গভীর তৃপ্তিতে ভরে গেল। যেন পুরুষসঙ্গ করে অশেষ তৃপ্তি পেয়েছ ও।"[৮]

অন্ত্যজ নারী জাতির প্রতি অবমাননা ও মাংসলোলুপ পুরুষবেশী পশুর প্রতি মেরীর এই সশস্ত্র প্রতিবাদ অবশ্যই আইনের চোখে অপরাধ। কিন্তু জীবন যেখানে বিপন্ন সেখানে প্রতিবাদের স্থান অবশ্যই রয়েছে, তা সে নিরুচ্চার প্রতিবাদেই হোক, কিংবা সোচ্চার।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর ছোটগল্প *'বাঁয়েন'*-এ ভয়াবহ অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য চিত্র এঁকেছেন। গল্পের বিষয়বস্তুতে লেখিকা এক অভিনব অথচ শাশ্বত মানবতাবাদের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। গল্পের কাহিনিতে লেখিকা শুরু করেছেন অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এক গ্রামীণ পরিবেশের উপস্থাপনার মাধ্যমে। যেখানে নায়িকা চণ্ডী জাতিতে ডোম। চণ্ডীর বাবা ভাগাড়ের কাজ করত, অর্থাৎ কারও মৃত্যু হলে তার জন্যে গর্ত খুঁড়ে দিত। চণ্ডী তার বাবার মৃত্যুর পর সেই কাজ আরম্ভ করে। কিন্তু তার চেতনায় ও বোধগম্যতায় সে বুঝে উঠতে পারে না শ্রেণি বিভক্ত ডোম সমাজের সৎকারের কর্মকে সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষজন কেন ঘৃণার চোখে দেখে? তার ভাবনায় প্রতিফলিত হয় চিরন্তন শ্রেণি বিভক্ত সমাজের শাশ্বত, চিরচারিত অবহেলিত, সামাজিক বৈষম্য বিভেদের রূপরেখা ও জ্বলন্ত প্রশ্ন -

> "তবে তাদের এত ঘেন্না করে কেন মানুষ। কেন ভয় পায়।"[৯]

সেই শবদেহ সৎকারের সূত্র ধরেই ওই গ্রামেরই বাসিন্দা মলিন্দরের সঙ্গে পরিচয় ও বিয়ে হয়। এক সন্তানের জননী হয় সে। কিন্তু একদিন অন্ধ কুসংস্কারে জরাগ্রস্ত ডোম সমাজের বিশ্বাসে হঠাৎ চণ্ডী হয়ে গেল বাঁয়েন, নিষ্ঠুর-নির্দয় শিশুহন্তা। স্বামী, সন্তান পরিবার থেকে সমাজ তাকে বিচ্যুত করে সমাজের এককোণে, একঘরে করে রেখে দেয়। যেন সে আলাদা জগতের প্রাণী। নিয়ম শাসনের বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয় তার পায়ে। এমনকি নিজের স্বামী সন্তানের পরিচয় দিতেও চণ্ডীকে নিষেধ করা হয়। তাই তার ছেলে ভগীরথ জ্ঞান হওয়া অবধি তার মাতৃপরিচয় জানতে পারে না। তাদের পুত্র ভগীরথের কখনও মনে হয়নি চণ্ডী বাঁয়েন কখনও কারও মা হতে পারে। কিন্তু পিতার থেকে মাতৃপরিচয় উদঘাটিত হবার পর ভগীরথের হৃদয় বিচলিত হয়। মা সমাজ স্বীকৃত বাঁয়েন হওয়া সত্ত্বেও মাতৃস্নেহের জন্য ভগীরথের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ভগীরথকে দেখেও চণ্ডীর চিরন্তন মাতৃসত্ত্বা জেগে উঠেছে। যে সমাজ একদিন তাকে বলতে বাধ্য করেছিল -

> "আমি বাঁয়েন। আমি ঘরের ছেলে ফেলে, মরা ছেলেকে দুধ দেই, মরা ছেলে লিয়ে সোহাগ করি। আমি বাঁয়েন।"[১০]

সেই একদিন মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও রক্ষা করে 'ফাইভ আপ লালগোলা' মেলকে বৃহত্তর ক্ষতি সাধনের হাত থেকে। তখন সেই সমাজই চণ্ডীকে তার আসল পরিচয় ফিরিয়ে দেয়। নিজের জীবন দিয়ে তাকে প্রমাণ করতে হয় –

> "আমি বাঁয়েন লই গো, মোর বুকে কচি ছেলা, মোর বুক দুধে ফেটে যায়। বাঁয়েন আমি লই"[১১]

তাই শেষ পর্যন্ত অন্ধবিশ্বাসী সমাজকে আবার বলতে হয়েছে চণ্ডী তাদের সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত। এখানে নারীর প্রতি অন্ধ কুসংস্কারে জীর্ণ সমাজের অত্যাচার ও তার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নিয়েই লেখকের সমাজ-সচেতন মন প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। নিপীড়িত জনের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের দেখার চেষ্টা করেছেন লেখিকা। তাদের সমস্যা অনুভবগম্য করে, তাদের মধ্যে স্বাধিকার বোধের সঞ্চার করতে চেয়েছেন। সামাজিক কুসংস্কারকে সামনে রেখে অন্যায় আর নিপীড়নের পটভূমি নির্মাণ করেছেন এই গল্পে।

পরবর্তী 'ধৌলি' গল্পে আমরা দেখতে পাই উচ্চবর্ণের রিরংসা ও তার ফলে অন্ত্যজ দুসাদ শ্রেণির এক নারীর সংকটময় জীবন কাহিনিকে। যেখানে রয়েছে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, প্রেম ও বিশ্বাসঘাতকতার নিদারুণ চিত্র। কেন্দ্রীয় নায়িকার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নামকরণ অনুসারে গল্পের নামকরণ করেছেন লেখিকা। কাহিনির প্রেক্ষাপট মানভূম, ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন অঞ্চল। অন্ত্যজ দুসাদ জাতির ধৌলি ভালোবেসেছিল উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ মিশ্রিলালকে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ধৌলি একথা জানত, নিম্নবর্ণের সাথে উচ্চবর্ণের পরিণয়কে কখনই শ্রেণি বিভক্ত সমাজ মান্যতা দেয় না। তবু মিশ্রিলালের প্ররোচনায় ও কপটতার জালে ধৌলিকে ধরা দিতে হয়। জৈবিক চাহিদার পরিণাম স্বরূপ তাকে গর্ভবতী হতে হয়। কিন্তু মিশ্রিলাল তাকে সামাজিক পরিচয় দিতে চাইলে, তার পরিবার প্রধান অন্তরায় হয়ে ওঠে। উচ্চবর্ণের বিকৃত কামনার বহ্নিতে অনেক অন্ত্যজ দুসাদ, গঙ্গু শ্রেণির নারীদেরকে আত্মহুতি দিতে হয়, জন্ম দিতে হয় জারজ সন্তানের। যেন সমাজের এক অলিখিত নিয়মে ও প্রতাপে অন্ত্যজ শ্রেণির নারীদের দেহসম্ভোগ করার ও অবৈধভাবে অন্তঃসত্ত্বা করার অধিকার সমাজের উচ্চবর্ণের পুরুষদের রয়েছে। তারা প্রতাপের দৌলতে অসংখ্য অন্ত্যজ শ্রেণির নারীদের উপভোগের বস্তু করে রাখতে পারে। গল্পে মিশ্রিলালের জননী কণ্ঠে ধ্বনিত হয় অন্ত্যজ শ্রেণির নারীদের সামাজিক অবস্থান-

"দুসাদ- গঞ্জু মেয়ের পেটে এ বংশের ছেলে আগেও হয়েছে।"[১২]

উচ্চবর্ণের পুরুষদের অসংযত কামনা ও তার ফলাফলে অন্ত্যজ নারীদের জীবন বিনিষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে উচ্চবর্ণের নারীরা বয়েসের গরম-এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। এই কারণেই মিশ্রিলালের মা ধৌলিকে মিশ্রিলালের স্ত্রী রূপে স্বীকার করতে চায়না, বরঞ্চ একজন খোরপোশ যুক্ত রক্ষিতা রূপেই দেখতে চায়। শুধু মিশ্রিলালের মা নয়, তার সমস্ত পরিবার তাদের সামাজিক অবস্থানের সম্পর্ককে মান্যতা দিতে অস্বীকার করে। এর জন্যে তারা ধৌলির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে ধানবাদে মিশ্রিলালের বিয়ের প্রচেষ্টা করতে থাকে। মিশ্রিলাল প্রথম দিকে বিয়ে করতে অস্বীকার করলেও, পরবর্তীতে সে উচ্চবর্ণের আর পাঁচজন শান্ত ভাল ছেলের মতো বিয়ে করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে মিশ্রিলাল ধানবাদে চলে গেলে অন্তঃসত্ত্বা ধৌলির জীবনে অস্তিত্বের সংকট ঘনীভূত হয় -

> "ধৌলি সবই জানত। ও প্রতিবাদ জানাবার কথা ভুলেও ভাবে নি। দুসাদ মেয়েকে ব্রাহ্মণের ছেলে কি এই প্রথম নষ্ট করল? গ্রাম সমাজের বিচারে সব দোষই ধৌলির। এতে প্রেম-ভালবাসার ব্যাপার থাকায় ধৌলি স্বসমাজের কাছেও ব্রাত্য। স্বসমাজের ছেলেদের সে আমল দেয়নি। না দিক। মিশ্রিবাড়ির ছেলেদের জারজ সন্তান দুসাদ-গঞ্জু-ধোবি টলিতে অনেক থাকে। এক্ষেত্রে ধৌলি স্বেচ্ছায় এগিয়ে গেছে। অমার্জনীয় অপরাধ।"[১৩]

সামাজিক স্বীকৃতি নয়, একজন রক্ষিতার জীবন যাপনের জন্য যতটা খোরপোষের দরকার সেই ততটুকু দাবীদারেরই প্রত্যাশা করেছিল ধৌলি। প্রাথমিক দিকে সে মিশ্রিলাল ও তার পরিবারের কাছে কিছু যৎসামান্য সাহায্য পেয়েছিল কিন্তু যত দিন এগিয়েছে খোরপোষের পরিমাণ কমতে কমতে এমন এক সময় আসে যখন মিশ্রিলালের পরিবার খোরপোষ দিতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। শুধু পরিবারের দিক থেকেই নয়, মিশ্রিলালের নিজের দিক থেকেও ধৌলির প্রাপ্তি হয়েছে কপটতা। জীবন যুদ্ধে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বাধ্য হয়ে দেহব্যবসায় নামতে হয়েছে তাকে। একদিকে নিজের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম, অন্য দিকে নিজস্ব সমাজের প্রাপ্ত অসহায়তায় ধৌলি 'বেওসা রাণ্ডীতে' পরিণত হয়েছে। এই পরিণতির জন্য সমাজব্যবস্থাও অনেকখানি দায়ী এবং এই ধরনের পথ নারীকে অবলম্বন করানোর জন্যে যে মিশ্রিলালরা দায়ী থাকেন, সেকথা সমাজে কখনওই বিবেচিত হয় না। সেই বাস্তব ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা তার কলমে।

'বিছন' গল্পের মূল অবলম্বন যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, সে দুলন গঞ্জু। অন্যদিকে রাজপুত লছমন সিং। দুলন গঞ্জুর মতো ব্যক্তি যারা সমাজে অন্ত্যজ বলে পরিচিত, তাদের লড়াইয়ের চিত্র গল্পের প্রতিটি ছত্রে ফুটে ওঠে। সমাজে ব্রাত্য হবার কারণে কিভাবে জীবনের সাথে লড়াই করে বেঁচে থেকেছে তার চিত্র গল্পে ছড়িয়ে পরেছে। গল্পে সর্বোদয়ের নেতা-কর্মীদের চাপে লছমন সিং জমি দান করে, কিন্তু সে জমি অনাবাদী। এতে তার কোনো ক্ষতি নেই, বরং শোষিত শ্রমিকদের ধরে রাখতে সুবিধা হল-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "জমি দেবার ব্যাপারটি সর্বার্থসাধক। বাঁজা জমি বেরিয়ে গেল। গ্রহীতাদের কিনে রাখা গেল। সরকারের কাছে নিজেদের খুঁটি আরও শক্ত হল।"[১৪]

সেই সময় এরকমই একটি জমির মালিক হয় দুলন। কিন্তু ফসলি জমি না হওয়া সত্ত্বেও সরকারের কাছ থেকে আদায় করে টাকা, বীজ আর সার। যা বিক্রি করে সে আনে 'বিছন'। লছমন সিংয়ের চোখ রাঙানিতে সে বাধ্য হয় সাধারণ জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে। গল্পটির মধ্যে বার বার শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা উঠে আসে। যে লড়াইয়ে হারিয়ে যায় দুলন গঞ্জুর আশেপাশের অনেক ব্যক্তি আর তাদের মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে বেদনা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় দুলনকে। বাঁচার কোনো রাস্তা খুঁজে না পেয়ে ধীরে ধীরে মানুষের মনে জাগ্রত হয় স্বাধিকার লড়াইয়ের চেষ্টা -

> "লড়াই গড়ে ওঠাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। লড়াইয়ের প্রয়োজনে লড়াই গঠন।"[১৫]

শ্রমের পাওনার দাবি জানায় আসরফিরা। দুলনের ছেলে ধাতুয়াও এই দলে নাম লেখায়, প্রতিবাদ করতে গিয়ে তারা মাটিতে পড়ে যায় চাপা। লড়াইয়ে হারিয়ে যায় করণ, বুলকি। লছমন সিং তাদের মাটি চাপা দিয়ে যায় দুলনের জমিতে। জীবনে সত্যের সাথে লড়াইয়ে চিরকাল হারিয়ে যায় তারা। শোকে উন্মাদ দুলনের পরিশ্রমে কাঁকুড়ে জমিতেও বিছন ধানের ফলন হয়, কিন্তু এই ধান সে কাটতে দেয় না। কারণ -

> "করণ, আসরফি, মোহর, বুলাকি মহুবন, পারশ ও ধাতুয়ার মাংসমজ্জার সারে পুষ্ট।"[১৬]

এই ধানের রহস্য কথা কেউ জানে না। তাই চিরদিন যে মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি, সেও প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠে। এক রাত্রে লছমন সিংকে পাথর দিয়ে মেরে, পাথর চাপা দিয়ে দেয় দুলন। একথাও কেউ জানতে পারে না। অন্ত্যজ মানুষগুলি যেমন করে হারিয়ে যায়, লছমন সিংও তেমনি হারিয়ে যায়। এভাবে যুগ যুগ ধরে হাজার হাজার প্রাণের বিনিময়ে টিকে আছে নিম্নবর্গীয় সমাজ। উচ্চবর্গীয় মানুষ তাদের অবিশ্রান্ত শোষণ করে চলেছে। আর এই শোষিত মানুষেরা করে চলেছে টিকে থাকার লড়াই। কারণ তাদের কাছে 'বিছন' মানে বেঁচে থাকার লড়াই। দুলনের কাছে তাই তার ছেলে বিছন হয়ে যায়। যে ছেলে বেঁচে থাকতে পিতার মুখে অন্ন তুলে দিতে পারেনি, মরে গিয়ে সে ধান হয়ে জন্মায়। দুলনের মধ্যে তাই আশ্চর্য প্রসন্নতা –

> "দুলন আস্তে আস্তে মাচানে ওঠে। মনের মধ্যে একটা সুর। অবাধ্য। ফিরে ফিরে আসছে। ধাতুয়া গানটা বেঁধেছিল। 'ধাতুয়া'- বলতে গিয়ে দুলনের গলা কেঁপে গেল। ধাতুয়া তোদের হম বিছন বনা দিয়া।"[১৭]

'মৌল অধিকার ও ভিখারী দুসাদ' ছোটগল্পে দেখানো হয়েছে সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে, বেঁচে থাকার জন্য ভিখারি বৃত্তি অবলম্বন করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না মানুষের। নওয়াগড়ের জমিদার রাজাসাহেবের সিপাহী ও পুলিশে মিলে দুসাদদের বকরা-বকরি কেড়ে নিয়ে যায় রাজাসাহেবের অতিথি অভ্যর্থনার জন্য। তখন বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত দুসাদ বুঝতে পারে-

> "ভিখারীর মৌল অধিকার যে বারবার ক্ষুন্ন হয়? রাজাসাহেবের ক্ষতিপূরণ মেলে, ভিখারীর মেলে না কেন?"[১৮]

তাহলে মৌল অধিকার শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য। সম্পত্তির অধিকারও তো মৌল অধিকার, তাহলে ভিখারি দুসাদ কেন ক্ষতিপূরণ পায় না? এই প্রশ্ন শুধু দুসাদদের নয়। দুসাদদের মতো প্রতিটি দলিত, ব্রাত্য মানুষের যারা অধিকার থেকে বঞ্চিত, উচ্চবর্ণের শাসন-শোষণে জর্জরিত। দুসাদদের ক্ষত-বিক্ষত মুখে চিহ্ন থেকে যায়, মৌল অধিকার রক্ষার প্রথম ও শেষ প্রতিবাদের। লেখিকা তাই গল্পের শেষে ব্যঙ্গের ঢঙে বলেছেন -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ভিখারী দুসাদ সাত নম্বর মৌল অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও, তিন নম্বর মৌল অধিকারের প্ররক্ষা পেয়েছে। স্বাধীনতার অধিকার। ও যাতে জন্ম-জন্মকাল ভিখমাঙাই থেকে যায়, ভারতের সংবিধান তা নিশ্চয় দেখবে।"[১৯]

তাই নির্যাতিত দুসাদ প্রতিকারের পথ খুঁজে না পেয়ে ভিখারী বৃত্তি অবলম্বন করে। আসলে উচ্চবিত্ত সমাজ কোনোদিনই নিম্নবর্গীয়দের উঠতে দেবে না, তাদের পথের বাধা হয়েই থাকবে এবং শোষণ করে যাবে। এই বাধার প্রতিকারের পথ না দেখালেও, লেখিকা সেই শোষণ যন্ত্রের প্রতি বিদ্রূপ করেছেন এই গল্পে।

গল্পগুলির এজাতীয় পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায়- অন্ত্যজ বা দলিত সমাজের কণ্ঠস্বর মহাশ্বেতা দেবীর গল্পগুলিতে উঠে এসেছে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মূর্তিটাকে প্রতিফলিত করার জন্য। অলোক রায় তাঁর 'ছোটগল্পে স্বদেশ স্বজন' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেন –

> "ছোটগল্প হিসেবে অনবদ্য কিন্তু শুধু গল্প শোনানো তাঁর উদ্দেশ্য নয়। আগুন জ্বালানো, পথ দেখানো, মানে খুঁজে বার করার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উদ্দেশ্য সাধনে এসব গল্প বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় কীর্তি।"[২০]

এই আগুন প্রতিবাদের আগুন, প্রতিরোধের আগুন। স্বাধীনতার পরও যখন দেশের মানুষ তাদের ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, সেখানে সূর্য সমান ক্রোধই বেরিয়ে আসে। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে বঞ্চিত মানুষের জীবনবাস্তবতা পাঠককে যেন এক অজানা মহাদেশে নিয়ে যায়। হতবিহ্বল পাঠক মানস জাগরনের তীব্র বেদনাকে ধারণ করে অনাবিষ্কৃত মানবজীবনের প্রতি সহানুভূতিতে সিক্ত হয়।

তাই পরিশেষে বলা যায় যে, প্রথাগত গল্প লেখার পরিবেশকে দূরে সরিয়ে সমাজের বঞ্চিত, শোষিত, দলিত মানুষের হৃদয়বিদারক কথা মহাশ্বেতা দেবী তার ছোটগল্পে যেভাবে তুলে ধরেছেন তা ভিন্নমাত্রা দান করেছে বাংলা সাহিত্য জগতের ছোটগল্পকে। যে বাস্তব চিত্র আমরা অন্য কোন গল্পকারের গল্পে এতটা বিস্তৃতভাবে পাই না। তাই সমাজের পতিত, বঞ্চিত, দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের ইতিহাস জানতে হলে মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প অধ্যয়ন আবশ্যক।

Reference:

১. দেবী, মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বই মেলা, ২০০১, পৃ. ৯৪
২. দেবী, মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নিউ দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ. ২৯
৩. ঐ, পৃ. ৩৮
৪. ঐ, পৃ. ৩৮
৫. ঐ, পৃ. ৩৯
৬. দেবী, মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বই মেলা, ২০০১, পৃ. ১৫৭
৭. দেবী, মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নিউ দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ. ৪৬
৮. ঐ, পৃ. ৫৮
৯. ঐ, পৃ. ৮৬
১০. ঐ, পৃ. ৮৮
১১. ঐ, পৃ. ৯০
১২. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র- ১০', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৪০৬
১৩. ঐ, পৃ. ৪০৭
১৪. দেবী, মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নিউ দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ. ১০
১৫. ঐ, পৃ. ১৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 216
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৬. ঐ, পৃ. ২৮
১৭. ঐ, পৃ. ২৮
১৮. ঐ, পৃ. ১৩১
১৯. ঐ, পৃ. ১৩২
২০. রায়, আলোক, 'ছোটগল্পে স্বদেশ স্বজন', অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪১৭, পৃ. ২৪৩